নিষ্কাম কর্ম (Niskām Karma) : 'নিষ্কাম' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল **নিঃ+কাম=নিষ্কাম**। অর্থাৎ, যে কর্মে কোন প্রকার কামনা বাসনা নেই, সেরূপ কর্মই হল নিষ্কাম কর্ম। আসক্তি শূন্য কর্মকেই তাই নিষ্কাম কর্ম রূপে অভিহিত করা হয়। আসক্তি শূন্য কর্ম কি? উত্তরে বলা যায়যে, আসক্তি শূন্য কর্ম বলতে কিন্তু কখনোই কর্মের প্রতি অনাসক্তিকে বোঝানো হয়নি। এখানে যা বোঝানো হয়েছে, তা হল কর্মফলের প্রতি অনাসক্তি। শ্রীমদভাগবতগীতায় এরূপ কর্মফলের প্রতি আসক্তি হীনতাকেই নিষ্কাম কর্মরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মফলের প্রতি আসক্তি থাকলে কখনোই নিষ্কামভাবে কর্ম করা সম্ভব নয়। সুতরাং ফলাকাঙ্খারোহিত কর্মই হল নিষ্কাম কর্ম। ফলাকাঙ্খা-রোহিত হয়ে কাজ করা একমাত্র তখনই সম্ভব যখনই তা ঈশ্বরের সমর্পিত। ঈশ্বরই হলেন আমাদের সমস্ত প্রকার কর্মের নিয়ামক। অজ্ঞতাবশতঃই আমরা আমাদেরকে নিজেদের কর্মকর্তা বলে মনে করি, এবং কৃতকর্মের জন্য ফল লাভের আকাঙ্খা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি ঠিত তা নয়। ঈশ্বরই হলেন আমাদের সমস্ত প্রকার কর্মের সর্বোচ্চ কর্ত্তা, এবং তাঁরই পরিচালনায় আমরা আমাদের কর্তব্য কর্মের সম্পাদন করি। সুতরাং কর্মফলের অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে, আমাদের কোন অধিকার নেই। এরূপ কর্ম করার কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শ্রীমদভগবত গীতায় উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই গীতায় বলেছেন ঃ

কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

অর্থাৎ, শুধুমাত্র কর্ম সম্পাদনেই অমাদের অধিকার আছে, কর্মফলে নয়। কারণ, আমরা আমাদের কর্মের প্রকৃত কর্তা নই, এবং সে কারণেই কর্মফলের প্রতি আমাদের কোন অধিকারই নেই।

ভারতীয় চিন্তাধারায় কর্মের সঙ্গে তার ফলকে অনিবার্য রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কর্ম আমাদের কামনার দ্বারা সিক্ত হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে কামনার অর্থ

Scanned with CamScanner

হল ফল লাভের কামনা। কামনার দ্বারা সিক্ত কর্মকে সকাম রূপে অভিহিত করা হয়। অপরদিকে, কামনার দ্বারা সিক্ত নয় যেকর্ম, সেই কর্মকেই বলা হয় নিষ্কাম কর্ম।সকাম কর্ম যেহেতু সংসার বন্ধনের হেতু, সেহেতু নিষ্কাম কর্মই আমাদের একান্তভাবে কাম্য হওয়া উচিত। কারণ, ভারতীয় চিন্তাধারায় নিষ্কাম কর্ম আমাদেরকে সমস্ত প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করে। গীতার আদর্শ যেহেতু আত্মজ্ঞান লাভ করা এবং মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করা, সেইহেতু গীতায় নিষ্কামভাবে কর্ম করার উপদেশই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমদভাগবতগীতাই হল নিষ্কামকর্মের প্রকৃত প্রচারক্ষেত্র। সাধারণতঃ গীতাকে আমরা একটি ধর্মগ্রন্থরূপেই গ্রহণ করি। কিন্তু দেখা যায় যে, গীতা শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থই নয়, এটি একটি নীতিশাস্ত্রও বটে। কারণ এখানে ধর্ম ও নীতি পরস্পরের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছে যে একটিকে আর একটি ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। ধর্ম এক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করেছে নৈতিকতার পটভূমিতে। এরই পরিপ্রেক্ষেতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার ক্ষাত্রধর্ম রক্ষার্থে কুরুক্ষেত্র নামক ধর্মযুদ্ধে প্রোৎসাহিত করেছেন নৈতিক উপদেশাবলীর মাধ্যমে। এই সমস্ত উপদেশাবলীর গূঢ় নিহিতার্থ হল নিষ্কামভাবে কর্ম করা এবং শ্রীভগবানে সমর্পিত চিত্ত হওয়া।

ভারতীয় দর্শনে এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নিষ্কাম কর্মের উপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় চিন্তাধারায় এরূপ কর্মকেই উচ্চস্তরের কর্ম বলে বন্দনা করা হয়েছে। কারণ, এরূপ কর্মই হল মানুষের আত্মোপব্ধির সহায়ক—যা মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে ধন্য করে। গীতায় যেহেতু নিষ্কাম কর্মের সর্বাধিকপ্রচার লক্ষিত হয়, সেহেতু নিষ্কাম কর্মতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং তার প্রকৃত প্রেক্ষাপটটিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

মহাভারতের বাহ্যিক প্রেক্ষাপটটি হল কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে কুরু-পান্ডবের যুদ্ধ। উভয় পক্ষই হল একই বংশোদ্ভুত। কুরুপক্ষ তথা কৌরবপক্ষ এবং পান্ডবপক্ষ উভয়ই যুদ্ধ করার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে উপস্থিত হলেও তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ বিদ্যমান। রাজদন্ডের অধিকার নিয়ে যুদ্ধের বাহ্যিক প্রেক্ষাপটটি রচিত হলেও, তার অন্তর্নিহিত প্রেক্ষাপটটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গভীর। এরূপ প্রেক্ষাপটটি হল—অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের যুদ্ধ ঘোষণা। সেকারণেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে **ধর্মযুদ্ধ** রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৌরব পক্ষ হলেন অন্যায় তথা অধর্মের প্রতীক, এবং পান্ডবপক্ষ হলেন ধর্ম তথা ন্যায়ের প্রতিভূ স্বরূপ। ধর্মযুদ্ধের প্রধান সৈনিক হলেন তৃতীয় পান্ডব অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন তার যুদ্ধরথের সারথি। তিনি শুধু বাহ্যিকভাবে অর্জুনের যুদ্ধরথের সারথিই নন, তিনি হলেন অর্জুনের জীবনরথের সারথিও। তাই তিনি অর্জুনকে ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ দিয়েছেন বার বার। নৈতিকতার আদর্শটি তিনি অর্জুনের মধ্যে প্রোথিত করতে চেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে এখানে নৈতিকতার প্রশ্নটি উত্থিত হয়েছে। কিন্তু নৈতিকতার বিষয়টি এখানে ঠিক কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, তা না হলে নিষ্কাম কর্মের বিষয়টি কখনোই সঠিকভাবে জানা যাবে না।

Scanned with CamScanner

বাহ্যত মনে হয় যে; রাজ্যপাটের কামনায় পান্ডবপক্ষ কুরুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ এবং শুধুমাত্র সেকারনেই তাঁরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রবৃত্ত। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তাঁরা আত্মীয়রূপী কৌরবদের সঙ্গে এরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তৎকালীন যুগে যতসব রথী-মহারথীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের প্রায় সবাই কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। অপরদিকে, পঞ্চপান্ডব, গুটিকয়েক আত্মীয় যোদ্ধা, এবং ন্যায় ও ধর্মের সংস্থাপক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হলেন শুধুমাত্র সারথিরূপে পান্ডবপক্ষে। এই যুদ্ধে মূল যোদ্ধা হলেন তৃতীয় পান্ডব অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ তার সারথি মাত্র।

গীতার সূচনা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত অর্জুনের বিষাদের মধ্য দিয়ে। যুদ্ধের প্রারম্ভেই রথোপবিষ্ট অর্জুন উভয় বাহিনীর মধ্যে তার রথস্থাপন করার নির্দেশ দিলেন। ঠিক সেইভাবে রথস্থাপিত হলে উভয় বাহিনীর মধ্যে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবদের অবলোকন করলেন এবং তাদের সংহার করার ভয়ে ভীত বিহ্বল হয়ে, গান্ডীব পরিত্যাগ করলেন এবং যুদ্ধ না করার মনস্থ করলেন। এ যাবৎ আমরা অর্জুনের যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করি—তা সকাম কর্মেরই দ্যোতক, এবং এর মূল উৎস হল অর্জুনের অজ্ঞতা। অজ্ঞতা একারণেই যে, অর্জুন এখনও পর্য্যন্ত তার ক্রিয়া কলাপের জন্য নিজেকেই কর্ত্তা রূপে মনে করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্জুন যে এত সমস্ত কিছুর কর্তা নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানই যে এর মূল কর্ত্তা—তা সারথি রূপী শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিভিন্নভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এখানে সবকিছুই যেন ঠিক করা হয়েছে, অর্থাৎ, পূর্ব নির্ধারিত, অর্জুন তার নিমিত্তমাত্র। এরূপ ভেবেই অর্জুনকে যুদ্ধ কর্ম করতে হবে। অর্জুনকে তিনি তাই তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম করতে প্রোৎসাহিত করেছেন। এরূপ ধারনার মধ্যেই নিষ্কামকর্মের নীতিতত্ত্বের বীজটি লুক্কায়িত।

নিষ্কাম কর্মের আবশ্যিক পূর্ব শর্ত হল যে—কর্মকর্তা তার কৃত কর্মজনিত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, স্তুতি-নিন্দা, লাভ-অলাভ এবং এবং জয়-পরাজয় সমস্ত কিছুতেই যেমন নিরুদ্বিগ্ন থাকবেন, তেমনি কর্মের ফল সম্পর্কেও উদাসীন থাকবেন। কর্মকর্তাকে বিষাদ-আনন্দ, কাম-ক্রোধ এবং লজ্জা-ভয় প্রভৃতিকে জয় করে দৃঢ়চেতা হতে হবে। যিনি নৈতিকভাবে এরূপ দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, একমাত্র তিনিই নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম। একমাত্র সেরূপ ব্যক্তিই জগতের কল্যান বা মঙ্গল সাধনে সমর্থ।

Scanned with CamScanner